International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

কোচবিহার অঞ্চলের মদনকাম সংস্কৃতি: একটি সমীক্ষা

বেদত্রয়ী ঘোষ

মদন বা কামোপাসনা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন ধর্মধারা। মদন বা কাম বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যে কোনোরূপ উন্নাসিকতা ছিল না। তার প্রমাণ মেলে প্রাচীন সাহিত্য থেকে শিল্প-ভাস্কর্যে। কিন্তু সময়ের প্রবাহে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐতিহ্যের ফল্গুধারা আজ বিভিন্ন রূপে আত্মগোপন করেছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজে প্রচলিত মদনকাম পূজা তারই সাক্ষ্যবাহী বলা যেতে পারে। কোচবিহার জেলায় চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী বা মদনভুঞি তিথিতে এই মদনকাম পূজা হয়ে থাকে। মদনকামের প্রতীক হল বংশদণ্ড। বাঁশকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে রাজবংশী সমাজে বেশ কিছু পূজা (যেমন—বুড়া মদনকাম, বাস্তু ঠাকুর) প্রচলিত হলেও এতদঞ্চলে মদনকামের পূজাই 'বাঁশ পূজা' হিসেবে বেশি পরিচিত। এমনকি, মদনকাম পূজা বা 'কান্দেব' পূজা (স্থানীয় ভাষায় কামদেব>কান্দেব) ও বাঁশ পূজা এই অঞ্চলে অনেক সময় একই উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই নিবন্ধে আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে মদনকামের পূজা এবং সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান-কৃত্য ইত্যাদির প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই সংস্কৃতির রূপরেখার একটি ধারণা তৈরি করবার চেষ্টা করব। কিন্তু সেই বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে জেনে নেওয়া দরকার, রাজবংশী সমাজে পূজিত এই মদনকাম সংক্রান্ত কিছু পুরাকথা ও লোকবিশ্বাস।

পুরা কথা ও জনশ্রুতি :

মদনকাম সম্পর্কে কোচবিহার অঞ্চলে বিভিন্ন কাহিনি, মিথ্ বা লোকবিশ্বাস প্রচলিত। তবে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত কাহিনিটি হল, শিব কর্তৃক মদনভস্ম ও তাঁর পুনর্জন্ম লাভের কাহিনি। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর শোকাতুর শিব নীলাচল পাহাড়ে গভীর ধ্যানমগ্ন হন এবং দেবতারা তাঁর ধ্যান ভাঙাবার জন্য যা শিবের মনে কাম উদ্রেক করবার জন্য কাম বা মদনকে প্রেরণ করেন। শিবের ধ্যান ভেঙে গেলে ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি ত্রিনয়নের অগ্নিতে মদনকে ভস্ম করে ফেলেন। মদনভস্মের পর মদনদেবের পত্নী রতি স্বামীর জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য শিবের স্তুতি শুরু করেন। শিব সন্তুষ্ট হলে মদনের পুনর্জন্ম ঘটে ও তিনি পূর্বের রূপ ফিরে পান। সেই থেকেই এই স্থানের নাম হল 'কামরূপ'। কালিকাপুরাণেও উল্লিখিত, হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়ে কামদেব এই স্থানে পুনরায়

স্বরূপ ফিরে পান তাই এই স্থানের নাম হয় কামরূপ এবং কামরূপে অবস্থান করে ব্রহ্মা নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন বলে তার প্রাচীন নাম 'প্রাগজ্যোতিষপুর'।[১] কথিত রয়েছে, নরকপুত্র ভগদত্ত ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি। অসমের কামাক্ষ্যা মন্দির ও কোচবিহারের গোসানীমারি কামতেশ্বরী মন্দিরের সঙ্গে ভগদত্তের মিথ্ জড়িয়ে রয়েছে। ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের মতে—

''রতির স্বামী কামদেবের এক নাম মদন অর্থাৎ মদনও যিনি কামদেবও তিনি। এই মদনকে শিব ভস্ম করিয়াছিলেন। মদন বা কামভস্মকারী শিবই মদনকাম হইয়াছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় যেহেতু মদনকামকে শিবজ্ঞানে পূজা করে, তাঁহার প্রতীক বংশদণ্ডকে শিবলিঙ্গ বলিয়াই সাব্যস্ত করিতে হয়।"[২]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে—প্রচলিত মিথ্ বা লোকবিশ্বাসে মদনকামের সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বলা যেতে পারে কোচবিহার অঞ্চলে শৈব ধারার সঙ্গে মদনের উপাসনার ধারা যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদনকামের পূজা হয়ে থাকে বাঁশের প্রতীকে। কোথাও পাঁচটি, কোথাও আবার দুটি বা একটি বাঁশ দিয়েও মদনকামের পূজা হয়ে থাকে। তাই একে বাঁশপূজাও বলা হয়। বাঁশের প্রতীকে মদনকাম পূজিত হওয়ার নেপথ্যেও সেই শিবকর্তৃক মদনভস্মের কাহিনী শোনা যায়। যথাস্থানে প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য বাঁশ পূজার সঙ্গে মানুষের সন্তান কামনা তথা বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে। তার প্রমাণ মেলে বাঁশ পূজার গানেও—

''এই বাঁশ পূজিলে কি বা ফল হয়?
এই বাঁশ পূজিলে ধনে পুত্র হয়।"[৩]

অপর একটি গানেও উল্লিখিত—

''কামাখ্যা শহরের লোক আগেয়া নেয় বরি
বরিয়া নেয় শহরের লোক পুত্র বাঞ্ছা করি।"[৪]

বোঝা যাচ্ছে যে, বাঁশের প্রতীকে মদনকাম পূজার অন্যতম উদ্দেশ্য হল কামোদ্রেক ও বংশ বিস্তারের বাসনা।

প্রতিবেদন :কোচবিহার শহরের মদনমোহন বাড়ি ও ডাঙর আই মন্দির এবং তুফানগঞ্জের বারকোদালী গ্রামের দামেশ্বর মহাদেবধাম কেন্দ্রিক মদনকাম উৎসব।

ক. মদনকাম পূজার সাধারণ পদ্ধতি:

মদনকামের পূজা হয়ে থাকে চৈত্র মাসের মদন-চতুর্দশী তিথিতে। পূজার তিথির

পূর্বে মদন-কাম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দুটি বাঁশ কেটে আনা হয়, একে বলা হয় 'মদনকামের বাঁশ তোলা'। বাঁশকর্তনের পর বাঁশগুলিকে আগুনে সেঁকে নেওয়া হয়। ত্রয়োদশীতে সেই বাঁশগুলিকে লাল শালু কাপড়ে জড়িয়ে মাথায় 'চঁহর' বা পাট নির্মিত চামর বেঁধে দেওয়া হয় এরপর বাঁশগুলিকে 'মারেয়া' অর্থাৎ গৃহস্বামী বাড়ির তুলসীতলায় প্রোথিত করেন। চতুর্দশীর দিন ঘট স্থাপন করে, হোম-যজ্ঞাদি দ্বারা মদনকামের প্রতীক স্বরূপ এই বাঁশগুলিকে পূজা করা হয়। লোকগবেষক অমূল্য দেবনাথ মহাশয় জানান—

''মদনকাম বা বাঁশ পূজার প্রধান উপাচার হল 'বাঁশের নাড়ু'। এই বাঁশের নাড়ু আবার দুরকমের হয়। মূলত আতপ চাল গুঁড়ো, দুধ, চিনি, আটা দিয়ে নির্মিত হয় এই নাড়ু। আবার এর সাথে ভাঙ্ মিশিয়ে ভাঙের নাড়ুও তৈরি করা হয়ে থাকে। এই নাড়ু মদনকামের খুবই প্রিয় বলে মনে করা হয়।''[৫]

বাঁশপূজায় বাঁশ কর্ত্তন, বাঁশ সৃজন, চামর সিজ্জন, ঘট সিজ্জন, নাড়ু সিজ্জন ইত্যাদি গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানগুলিকে 'বাঁশপূজার গান' বলা হয়। চতুর্দশীতে পূজা শেষের পর, পূর্ণিমার দিন (সাধারণত সন্ধ্যে বেলায়) এলাকার সকল গৃহস্থ বাড়িতে পূজিত মদনকামের বাঁশ নিয়ে যাওয়া হয় কোনো নির্দিষ্ট নদী বা পুকুরে এবং সেখানে বাঁশের চামর ভিজিয়ে ঠাকুরকে জল পান করানো হয়। এই রীতিটিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'বাঁশক জল খাওয়ানো'। কোনো কোনো অঞ্চলে পূর্ণিমার দিন থেকে মদন-কামের বাঁশ নিয়ে দলবেঁধে নৃত্য-গীত সহকারে বাড়ি বাড়ি মাগন তোলার রীতিও প্রচলিত। মদনকামের একটি গানে এর উল্লেখ রয়েছে—

''ত্রয়োদশীতে বাশোত কাপড়, চতুর্দশীতে হম্
পূর্ণিমাতে বাড়ি বাড়ি বেড়ায় মদনকাম।''[৬]

পূর্ণিমার দিন এলাকায় পূজিত বাঁশগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয় 'বাঁশের থলায়' এবং সেখানে কামদেবের ভক্ত্যাগণ সারারাত জেগে নাচ গান করে। ড. সুখবিলাস বর্মার জাগগান গ্রন্থে উল্লিখিত যে, এই বাঁশের থলায় আবার কামরূপী ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিব মন্ত্রে ঐ বাঁশগুলিকে পূজা করেন।[৭] পূজা শেষে মদনকামের বাঁশ বিসর্জন হয় এবং মদনকামের বাঁশ গৃহস্থ বাড়িতে ফিরে আসে। মদনকামের বাঁশ ঘরে নিয়ে যাওয়ার একটি গান এখানে উল্লেখ করা হল—

''যায় ধইরবেন চাইলন বাতি
তায় পাইবেন বর পাছা রাতি।

আরে হাপসি আসিল মদনকাম
মদন ফিরিয়া আসিল রে।"[৮]

খ. **কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ি ও ডাঙর আই মন্দিরের মদনকাম পূজা তথা বাঁশ পূজা:**

কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে চৈত্র মাসের চতুর্দশীতে মদনকাম বা 'কান্দেব'-এর পূজা হয়ে আসছে রাজআমল থেকে। পাশাপাশি এই পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্ত ও নৌকাবাইচ। রাজবংশী সমাজের রীতি অনুযায়ী বাঁশপূজা হলেও এই মন্দিরে কন্দর্পের পূজাও করা হয় মূর্তি সহকারে। কন্দর্প মূর্তির দুহাতে থাকে ধনুক ও তীর এবং কন্দর্পের চারদিকে থাকেন চারজন সখী বা ব্রতী, যথা—'রতি', 'প্রীতি', 'গৌরী' ও 'মন্মথ'।[৯] এই কন্দর্প বা কামদেব হলেন বিষ্ণুরই রূপ। পাশাপাশি পাঁচটি বাঁশ প্রোথিত করে বাঁশ পূজা হয়ে থাকে। সাধারণত রাজবংশী রীতি অনুযায়ী ত্রয়োদশীতে বাঁশে কাঁপড় সিঁজ্জন অর্থাৎ বাঁশে কাপড় পড়ানোর প্রথা প্রচলিত। কিন্তু মদনমোহন বাড়িতে বাঁশে কাপড় পড়ানো হয়ে থাকে এক দিন আগে অর্থাৎ দ্বাদশীতে। কারণ, এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজ ঐতিহ্য। তাই সবার আগে মদনমোহন মন্দিরের পাঁচটি বাঁশে কাপড় সিজ্জন করা হয়। এই পূজার প্রধান উপকরণ হল ভাঙের নাড়ু যা মূলত আতপ চালের গুঁড়ো, দুধ, চিনি ও ভাঙের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়াও থাকে ভাঙ্ মিশ্রিত সন্দেশ যাকে 'মাজুম' বলা হয় এবং থাকে ঘোঁটার শরবত। পূজায় পায়রা বলি দেওয়া হয় ও বলিদত্ত মাংস ভোগে নিবেদন করা হয়। এইদিন মন্দিরের পেছনের দিকে একস্থানে একটি খাসি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। (গলায় ফাঁস দিয়ে, মাথায় খিল ঠুকে) এবং সেটিও কামদেবের ভোগে নিবেদন করা হয়। এরপর পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরে পূজিত পাঁচটি বাঁশের মধ্যে একটিকে নিয়ে যাওয়া হয় সাগর দিঘিতে এবং তার সাঙ্গে ডাঙর আই মন্দিরে পূজিত দুটি বাঁশের মধ্যে একটি বাঁশও সেখানে নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, ডাঙর আই মন্দিরে দুটি বাঁশ পূজিত হয় এবং এখানেও পায়রা বলি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, মদনমোহন মন্দিরে বলিপ্রদত্ত খাসির মাংসও এই ডাঙর আই মন্দিরে প্রেরণ করা হয় এবং হোম সহকারে পূজান্তে মন্দিরের ভোগঘরে ঘোঁটার শরবত, মাজুম ও বলিদত্ত মাংস ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়ে থাকে।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলায় ডাঙর আই মন্দিরে পূজিত দুটি মদনকামের বাঁশের মধ্যে একটি বাঁশ নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহন মন্দিরে। তার সঙ্গে মন্দিরের

রাধাবিনোদ বিগ্রহকেও নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার জন্য। মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্ত যাত্রার একেবারে প্রথমেই থাকে এই মদনকামের বাঁশ দুটি। মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বাঁশ দুটিকে সাগরদিঘির জলে সামান্য ডুবিয়ে তুলে জল পান করানো হয়। অর্থাৎ মদনকামের বাঁশ দুটিকে নেওয়া হয়। এরপর মদনমোহন মন্দিরের বাঁশটিকে মন্দিরে নিয়ে এসে পুনরায় পূজার স্থানে রেখে দেওয়া হয়। প্রতিপদের দিন মদনমোহন বাড়ি সংলগ্ন বৈরাগী দিঘিতে কন্দর্পের মূর্তি বিসর্জিত হয় এবং বাঁশগুলি থেকে সেই লাল কাপড় খুলে মন্দিরের একস্থানে রেখে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর নতুন বাঁশ কেটে কাপড় সিজ্জন করে মদনকাম পূজা হয়ে থাকে। তবে লক্ষণীয় যে, মদনকামের বাঁশের মাথায় পাটনির্মিত চামর দেখা যায় আবার শিবের থানে পূজিত হলে বাঁশের মাথায় ত্রিশূল প্রোথিত থাকে। কিন্তু মদনমোহন বাড়িতে পূজিত মদনকামের বাঁশগুলির মাথায় কোনোরকম চামর বা ত্রিশূল থাকে না। লোকগবেষক অমূল্য দেবনাথ মহাশয় জানান—''পাঁচটি বাঁশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট বাঁশটিকে বলা হয় 'দ্যাও গোছ'। স্থানীয় ভাষায় 'দ্যাও' অর্থাৎ দেবতা এবং 'গোছ' কথার অর্থ হল খুঁটি।''[১০]

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, বাঁশের প্রতীকে মদনকাম পূজার নেপথ্যে রয়েছে এক লোকবিশ্বাস। কোচবিহারের গুঞ্জবাড়ি ডাঙর আই মন্দিরের পুরোহিত জানকীনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে শোনা গেল সেই কাহিনি—

''শিবের ত্রিনয়নের অগ্নিতে ভস্মীভূত হলে মদনের স্ত্রী রতি স্বামীর প্রাণভিক্ষার জন্য মহাদেবকে বহু মিনতি করে। অপরদিকে দেবকূলও চিন্তিত হয়ে পড়ে কারণ মদন বা কামই যদি পৃথিবীতে না থাকে তবে সৃষ্টি হবে কীভাবে? জগত সংসার যে অচল হয়ে পড়বে। তাই সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেবতারাও মহাদেবকে অনুরোধ করেন। অতঃপর এই বাঁশের মধ্য দিয়ে পুনরায় কামের সৃষ্টি হয়। এই কারণে দেখা যায়, বাঁশের কখনো বংশ ধ্বংস হয় না। একটু মাটি পেলেই বাঁশ থেকে অসংখ্য গুঁজি। অর্থাৎ বাঁশ বংশবিস্তার করে খুব দ্রুত।''[১১]

গ. মদনমোহনের প্রাশ্চিত্ত:

প্রায়শ্চিত্ত আচারটি যদিও মদনমোহন দেবতাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবুও মদনকাম পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করে আমার এখানে অনুষ্ঠানটির বর্ণনা করছি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামদেবের পূজা উপলক্ষে মদনমোহন মন্দিরে পায়রা ও খাসি বলি (গলায় ফাঁস দিয়ে, মাথায় খিল

ঠুকে) দিয়ে তা কন্দর্পের ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। ঐদিন এই ভোগ রন্ধন হয়ে থাকে মদনমোহনের ভোরেই ফলত এই মাংস রন্ধনের সময় মদনমোহনের ভোগেও তার ছোঁয়াচ লাগে এবং এভাবেই এইদিন বৈষ্ণব মদনমোহন আমিষ খেয়ে ফেলেন। যার ফলস্বরূপ পূর্ণিমার দিন সম্পন্ন হয় তাঁর প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান।

মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে মদনবকাম পূজার এক বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির রাজপুরোহিত শ্রী হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট শোনা গেল মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্তের সাথে জড়িত নেপথ্য কাহিনিটি—

''কথিত রয়েছে, মদনচতুর্দশীতে মদনকাম পূজা উপলক্ষে মদনমোহন ভাঙের নাড়ু ও ভাঙমিশ্রিত সন্দেশ খেয়ে ফেলেন এবং নেশাচ্ছন্ন হয়ে 'কামদেবের পূজার মহাপ্রসাদ' খাসির মাংসও ভক্ষণ করেন। কিন্তু নেশার ঘোর কাটতেই মদনমোহন চিন্তিত হয়ে পড়েন তাঁর এই নীতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের জন্য এবং তাঁর বন্ধুদের নিকট বিধানের জন্য শরণাপন্ন হন। মদনমোহনের সঙ্গীরা অর্থাৎ বাণেশ্বর, ষণ্ডেশ্বর প্রমুখরা মিলে আলোচনা করেন কীভাবে বৈষ্ণব মদনমোহন মাংসভক্ষণের এই পাপ থেকে উদ্ধার পাবেন। পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা বিধান দেন যে, মদনমোহনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পাঁঠার ভুঁড়ির জল দিয়ে স্নান করে তবেই তাঁর পাপস্খালন হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। পূর্ণিমার দিন তাই মদনমোহনের সঙ্গীরা সকলে মদনমোহন বাড়িতে এসে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যাবেলায় মদনমোহনকে নিয়ে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের জন্য সকলে মিলে যাত্রা করেন।''[১২]

গত ১৫/০৪/২২ তারিখে কোচবিহারের ডাঙর আই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ চক্রবর্তীর সহিত কথোপকথন সূত্রে জানা গেল মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে জড়িত অপর একটি কাহিনি। কাহিনিটি সংক্ষেপে এইরূপ—

''শ্রীকৃষ্ণের অনিরুদ্ধ ও বাণাসুর কন্যা ঊষার বিবাহে পিতামহ হিসেবে কৃষ্ণ নিমন্ত্রিত ছিলেন এবং পরম শিবভক্ত বাণাসুরের আহ্বানে শিবও সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠানে ছিল সব আসুরিক ভোজনের ব্যবস্থা। ফলত সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে শ্রীকৃষ্ণকে আপ্যায়ন করে ঘোঁটার শরবত খেতে দেওয়া হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ তা পানও করেন। কিন্তু এরপর নেশাচ্ছন্ন হয়ে কৃষ্ণ ভাঙের নাড়ু, ভাঙের বড়া এমনকি নেশার ঘোরে খাসির মাংসও খেয়ে ফেলেন। মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কর্মকাণ্ড লক্ষ করে তাঁকে বলেন—তুমি বৈষ্ণব! আর

এইসব মাংসাদি আসুরিক খাদ্যদমূহ ভক্ষণ করলে! এরপর শিবের বিধান মতে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেন এই মদনপূর্ণিমা তিথিতে।"[১৩]

মদনকাম পূজার পর দিন পূর্ণিমা তিথিতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ কোচবিহারের মদনমোহন জীউকে চৌদোলায় করে নিয়ে আসা হয় সাগরদিঘির পূর্বঘাটে। তাঁর সঙ্গে থাকেন বৃষসহ বাণেশ্বরের চলন্ত মহাদেব, তুফানগঞ্জ মহকুমার যণ্ডেশ্বর শিব, গুঞ্জবাড়ি ডাঙর আই মন্দিরের রাধাবিনোদ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুয়ায়ী, এঁরা সকলেই হলেন মদনমোহনের বন্ধু। মদনমোহনের সঙ্গে তাঁরাও পৃথক পৃথক চৌদোলায় চেপে যাত্রা করেন। এরপর সাগরদিঘির পূর্বঘাটে স্থিত একটি সুসজ্জিত নৌকায় মদনমোহনকে বসানো হয়, কোচবিহারের দুয়ারবক্সী মহাশয় সেখানে পাঁঠার ভুঁড়ির জল দিয়ে মদনমোহনকে স্নান করান এবং মদনমোহনের চরণ লক্ষ্য করে পঞ্চফল জলে অর্পণ করেন। মদনমোহন বাড়ির রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় জানান-

''মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটি পাঁঠাকে বলি দেওয়া হয় এবং তার ভুঁড়িকে আলাদাভাবে বের করে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। সেই পাঁঠার ভুঁড়ির সঙ্গে রাজআমলের রূপোর 'কূপা' বা নল লাগিয়ে সেই নলের মাধ্যমে তাতে সাগরদিঘির জল ভরা হয়। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের সময় মাননীয় দুয়ারবক্সী মহাশয় এই রূপার কূপ দিয়েই মদনমোহনের গায়ে পাঁঠার ভুঁড়ির সেই জল ছিটিয়ে দেন।"[১৪]

এভাবেই মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হয় এবং এরপর সেই সুসজ্জিত নৌকায় চেপে মদনমোহন নৌকাবিহার করেন, যা মদনমোহনের 'নৌকাবাইচ' বা 'বাইচখেলা' হিসেবে প্রসিদ্ধ। এই সময় তাঁর সঙ্গীরা অর্থাৎ বাণেশ্বর শিব, যণ্ডেশ্বর শিব প্রমুখরা সাগরদিঘির পূর্বঘাটে উপস্থিত থাকেন প্রায়শ্চিত্তের সাক্ষী হিসেবে। নৌকাবিহার শেষে পাপস্খালন করে মদমোহন 'বন্ধুদের' সহিত ফিরে আসেন মদনমোহন বাড়িতে। ডাঙর আই মন্দিরের রাধাবিনোদ বিগ্রহও ফিরে যান। কিন্তু দূরত্বের কারণে বাণেশ্বর ও যণ্ডেশ্বর শিব সেই রাতে কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতেই 'অতিথি' হিসেবে অবস্থান করেন এবং পরের দিন বিশেষ পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর নিজ নিজ মন্দিরে ফিরে যান।

ঘ. দামেশ্বর মহাদেব ধামের মদনকাম পূজা তথা বাঁশপূজা:

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী গ্রামের দামেশ্বর মহাদেব ধামেও চৈত্রমাসের মদনচতুর্দশীতে বাঁশপূজা হয়ে থাকে। তবে বারকোদালী গ্রামের বাঁশ

পূজার অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। রাজ আমলে নির্মিত দামেশ্বর শিবমন্দিরে একটি বাঁশই পূজিত হয় মদনকাম পূজার দিন। মন্দিরে পূজিত বাঁশটির মাথায় একটি ত্রিশূল প্রোথিত থাকে। যেহেতু এই বাঁশ শিবের থানের জিনিস অর্থাৎ মহাদবের থানে পূজিত, তাই তার মাথায় ত্রিশূল থাকে।[১৫] তবে এই মন্দিরে মদনকামের পূজায় কোনোরূপ বলি হয় না। দোমেশ্বর মহাদেবধামের বাঁশপূজাকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলে বাঁশপূজার মেলা ও বাঁশের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে প্রতিবছর।

মহাদেব ধামের বাঁশটিকে প্রথমে রায়ডাক নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। বড় মহাদেবের বাঁশ জল না খাওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের কোনো গৃহস্থ বাড়িতে পূজিত মদনকামের বাঁশকে স্নান করানো হয় না। স্নানপর্বের পর এলাকার সকল গৃহস্থ বাড়িতে পূজিত মদনকামের বাঁশ একজায়গায় একত্রিত হয়। অতঃপর শুরু হয় বাঁশের দৌড় প্রতিযোগিতা, যাকে স্থানীয় ভাষায় 'বাইচ খেলা' বলা হয়ে থাকে। এই বাঁশগুলিকে বলে 'হমকার বাঁশ'।[১৬] স্থানীয় মতে, এই অঞ্চলে উচ্চতার কারণে সবথেকে প্রসিদ্ধ হল 'জামদারী বাঁশ' ও 'ডাকুয়ার বাঁশ'। এই হমকার বাঁশগুলিকে নিয়ে হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। নিয়মানুযায়ী এলাকয় যার বাঁশ সবার প্রথম 'বাঁশের থলায়' অর্থাৎ বাঁশের মেলার স্থানে পৌছায়, তাকে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই মেলায় মহিলারা উপস্থিত থাকেন না। এই বাঁশের থলায় বাইচ খেলা শেষে কান্দেবের দল বা মদনকামের দল আদিরসাত্মক গান ও নৃত্য করে থাকে। এই নৃত্য-গীতের আসরেও শিশু ও নারীদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। দামেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত শচীন দেবশর্মা মহাশয় জানান যে—

''অনেকে আবার এই কামদেবের গান মানতও করে থাকে তখন আলাদাভাবে মদনকামের গান দেওয়া হয় যেখানে বাঁশের জন্মকথা, কামের জন্মকথা, মালা গিরিবরের ঘটনা এসবই গাওয়া হয়। কিন্তু বাঁশের থলায় কান্দেবের গানগুলিতে যৌন অঙ্গভঙ্গি, কাম উদ্দীপক কথাবার্তাই থাকে প্রধানত। পূর্বে মদনচতুর্দশীর পরদিন কোচবিহারের মদনমোহন জীউর প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে দামেশ্বর মহাদেবও যোগদান করতেন কিন্তু রাজ আমলেই কোনো একবার যাত্রাপথে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফলে সেই থেকেই দামেশ্বর মহাদেব মদনমোহন জীউর প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে আর যোগদান করেন না।''[১৭]

ঙ. মদনকামের গান:

মদনকামের পূজার সঙ্গে জড়িত গানকে বলা হয়ে থাকে 'জাগ গান' বা

'জাগের গান'। মাগন তোলার সময় বাঁশের থলায় কামদেবের ভক্ত্যাগণ এই গানগুলি ঢাক, ঢোল, কাঁসি ইত্যাদি বাদ্য সহকারে পরিবেশন করে থাকে। তবে প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার, এই গানগুলিকে 'জাগ গান' কেন বলা হয়। ড. সুখবিলাস বর্মা তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়ে কোচবিহার জেলার ধুমপুর এর অধিবাসী শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি কাহিনির উল্লেখ করেছেন।[১৮] সেই কাহিনি অনুসারে, মদনভস্মের পর মহাদেবের নিকট মদনচতুর্দশীতে দেবতাগণ সকলে মিলে মদনকামদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাগেন এবং সারারাত জেগে ভস্মীভূত মদনকে পুনঃ জাগ্রত করেন। এই কাহিনি থেকেই পূর্বকালের কবিরা জাগ গান রচনা করেছিলেন। জাগ অর্থে জাগরণ অর্থাৎ কাম জাগরণী শব্দ থেকে জাগ গানের সৃষ্টি।[১৯] কোচবিহারের বারকোদালী গ্রামের অধিবাসী অনন্ত বাপারী মহাশয় এই জাগগান সম্বন্ধে জানান—

''কাম ছাড়া জগত চলে কি? কান্দেবের পূজায় নাচ-গান করে, অঙ্গভঙ্গি করে মানুষের মনে কাম জাগাতেই এই গানগুলি হয়। মদন বা কামকে জাগায় তাই জাগ গান। আবার এও হতে পারে, যেহেতু আগে সারারাত জেগে থলায় কান্দেবের দল এই গানের আসর করত, সারারাত ধরে নাচগান চলত, তাই হয়ত এই গানের নাম জাগের গান।"[২০]

জাগ গানের মধ্যে একদিকে রয়েছে বাঁশ পূজার গান যেখানে আসর বন্দনা, মদনকামের জন্মকথা, বাঁশ সৃজন ইত্যাদি কাহিনি গীত হয়। অন্যদিকে রয়েছে কামদেবের বা কান্দেবের গান যা মোটা জাগ ও সরু জাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। সুখবিলাস বর্মার মতে, কামদেবের গান ও বাঁশ পূজার গানকে জাগ গানের দুই অঙ্গ বলা যেতে পারে।[২১] জাগ গান গ্রন্থে উল্লিখিত, সাধারণত অশালীনতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে এই গানকে 'মোটা জাগ', সরু জাগ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।[২২] সরু জাগের মধ্যে 'কানাই ধামালী' বা 'লীলা জাগ' বিশেষত খ্যাত এবং এই গানগুলি কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালায় বিভক্ত, যেমন—রাধার শাক তোলা, কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা, রাস ইত্যাদি।[২৩] সাধারণত সরু জাগের গানগুলিতে আদিরসের প্রধান্য কিছুটা কম।

মোটা জাগের গানগুলি পুরোপুরি আদিরস সমৃদ্ধ যা তথাকথিত ভদ্ররুচির মানদণ্ডে একেবারেই 'অশালীন'। তবে মনে রাখতে হবে, কামজাগরণই এই জাগ গানগুলির মূল উদ্দেশ্য এবং রাজবংশী জনজাতির এই লোকসঙ্গীতের ধারায় লোকমানসের জীবনরস ফুটে উঠবে এটাই তো স্বাভাবিক। মোটা জাগগুলি

সাধারণত পরিবেশিত হয় বাঁশের থলায়। একটি মোটা জাগের কিছু অংশ উল্লেখ করা হল—

ও পূবাল বাতাসে নারীর মন ঝুরে রে
হাউ খ্যায়া ** মাথাত চড়িছে
মাথা হাতে পাড়ে ** ত্যালোত দিলে ছাড়িয়া
ত্যালখ্যায়া ** হইল পিছিলা।[২৪] (** চিহ্নিত স্থানে যৌনাঙ্গ জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত।)

মদনকামের দল নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে বাড়ি বাড়ি মাগন সংগ্রহ করে। বাঁশ হাতে নিয়ে মাগনের দল ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্য সহকারে বিভিন্ন ছুট গান, নৃত্য সহকারে পরিবেশন করে থাকে। মদনকামের একটি গানেও এই বাঁশ খেলানোর কথা উল্লিখিত—''মোর বাঁশ খেলাইতে যায় কামাখ্যা শহর''।[২৫] কান্দেবের গানের সঙ্গে যে নাচ করা হয়, তা স্থানীয় ভাষায় 'কান্দেবের নাচ' নামে পরিচিত। মাগন সংগ্রহের শেষে পূর্ণিমার দিন বাঁশের থলাতে তারা একত্রিত হয় ও সেখানে চলে কামদেবের বিভিন্ন দলের নাচ-গান। বাঁশের থলায় অংশগ্রহণকারী মদন-কামের গানের বিভিন্ন রীতির দলগুলি হল—মোটা জাগের দল, কামদেবের দল, টিনবাজার দল, ক্যানবাজের দল ও ঢুলুয়া রীতির দল।

বাঁশের থলায় কামদেবের দলগুলির এই নাচ-গানের প্রসঙ্গে 'নরকের গান' কথাটিও প্রচলিত। লোকগবেষক অমূল্য দেবনাথের সঙ্গে এপ্রসঙ্গে কথোপকথন সূত্রে জানা গেল—

''পূর্বে রাজবংশী সমাজে এই বাঁশ পূজার প্রচলন ছিল অনেক বেশি। পূর্ণিমাতে এলাকার সকল গৃহস্থ বাড়িতে পূজিত মদন কামের বাঁশ দিয়ে মিছিল হতো এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে, সাধারণত কোন মাঠে বাঁশগুলিকে একত্রিত করে সাজিয়ে রাখা হতো দণ্ডায়মান অবস্থায়। সেখানে বাঁশগুলিকে জড়োয়া কাপড় দিয়ে সজ্জিত করা হতো। বাঁশের উচ্চতা, বাঁশ গুলির রূপ-সজ্জা ইত্যাদির নিরিখে বিজয়ী ঘোষিত করা হতো ও রূপার মেডেল পড়িয়ে দেয়া হত। এই প্রতিযোগিতাই 'বাঁশের নরক' হিসেবে পরিচিত। তবে এর প্রচলন এখন তেমন একটা নেই। এই বাঁশের নরকে কান্দেবের বিভিন্ন দলের (মোটা জাগের দল, চুলুয়া রীতির দল, টিনবাজার দল প্রভৃতি) পাশাপাশি কুশান গানের দল, দোতরা গানের দল, বিষহরার দলও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বাঁশ পূজার নরকে অনুষ্ঠিত হয় বলে একে 'নরকের গান' বলা হয়ে থাকে। জনসমাজে প্রচলিত 'নরকের গান

শুনতে যাওয়া' কথাটির মাধ্যমে আসলে এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলের গান শুনতে যাওয়ার কথাই বোঝানো হয়ে থাকে।"[২৬]

সহজেই অনুমিত হয় যে, মদনকামের উৎসব কোচবিহারে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এও বোঝা যায় যে, সেই জনপ্রিয়তার ধারা আজও অনেকংশে সজীব রয়েছে। বস্তুত শুধু কোচবিহার নয়, উত্তরবঙ্গ ও অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মদনকামের উৎসব বা বাঁশপূজা বিভিন্ন রূপে প্রচলিত আছে, উল্লেখ্য, কোচবিহারের হরিপুর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও জড়িত রয়েছে মদনকামের আখ্যান। প্রচলিত মিথ্ অনুযায়ী, বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণবাজার প্রাসাদে গোপনে প্রবেশ করে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। এই সংবাদ বাণরাজার কাছে এলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অনুরুদ্ধকে বন্দী করলেন। আবার অনিরুদ্ধের কারাবন্দীর সংবাদ পেয়ে দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণ, পিতা প্রদ্যুম্ন সৈন্যসামন্তসহ তাঁকে উদ্ধার করতে বাণাসুরের রাজ্যে প্রবেশ করলে বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এমতাবস্থায় মহাদেবের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত বাণাসুরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন। ভক্ত বাণাসুর এরপর মহাদেবের আদেশ মত ঊষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ দেন বাণেশ্বরের নিকট বৈকুণ্ঠপুরে। এই উপলক্ষে মহাভোজও আয়োজিত হয় এবং সেখানে শিবও নিমন্ত্রিত থাকেন। বস্তুত, যে স্থানে মহাদেব কর্তৃক কৃষ্ণ ও বাণাসুরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিবকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পূর্বক শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন, তাই এই স্থানে শিব 'হরিশ্বর' এবং বর্তমানে 'হরিপুর' নামেই স্থানটি পরিচিতি। ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধে 'অনিরুদ্ধ হরণ' বৃত্তান্তে বাণরাজার সহিত এই যুদ্ধের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে।'[২৭] লক্ষণীয়, কোচবিহারের লোকমানস তথা লোকপুরাণে আজও প্রচলিত রয়েছে বাণরাজা তথা বাণাসুরের বিভিন্ন কাহিনি। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, বাণাসুর ছিল এতদঞ্চলের রাজা। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা বলিপুত্র বাণ ছিলেন পরম শিবভক্ত এবং তাঁর রাজধানী ছিল শোণিতপুরে। উল্লেখ্য, আসামের শোণিতপুরে আজও বাণারাজার গড় রয়েছে। এই পৌরাণিক বাণাসুরের সঙ্গেই জড়িত মদনমোহনের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনি এবং তার পাশাপাশি বাণেশ্বর শিবমন্দির, হরিপুর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বংতী নদী সৃষ্টির মিথ্।

গুরুত্ব : অনুমান করা যায়, বহু কাল থেকেই মদনকামের পূজা তথা মদনকামের ধর্মধারা সমগ্র কামরূপ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। 'অসমের খাজুরাহো' হিসেবে পরিচিত মদনকামদেবের প্রাচীন মন্দিরটি তার একটি অন্যতম

নিদর্শন। রাজবংশী সমাজে পূজিত এই মদনকামের সঙ্গে কখনো শিব আবার কখনো মদনমোহনের কাহিনি জুড়ে গিয়েছে। কোচবিহারের মদনমোহন জীউর প্রায়শ্চিত্ত উৎসব বা দামেশ্বর মহাদেব ধামে পূজিত মদনকামের বাঁশের মাথায় প্রোথিত ত্রিশূল তারই প্রমাণ স্বরূপ। আবার এই মদনকামের বাঁশপূজার সঙ্গে রাজবংশী জনজাতির সন্তান কামনা তথা বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যও জড়িত। বাঁশপূজার বিভিন্ন আচার, বাঁশপূজার গান তথা জাগ গান, বাঁশের থলায় কান্দেবের দলের যৌন অঙ্গভঙ্গিমূলক নৃত্য-গীতের আসর ইত্যাদি লক্ষ করলে বোঝাই যায় যে, এই মদনকামের বাঁশ পূজার সঙ্গে উর্বরতা সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাসের একটা যোগ রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের পূজা প্রাচীন মদন বা কামোপাসনার ধারারই এক বিবর্তিত আঞ্চলিক রূপ যার সঙ্গে মিশে রয়েছে রাজবংশী জনজাতির নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, মিথ্ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব। এই নিবন্ধে মদনকাম সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনি, জনশ্রুতি, বিশ্বাস, আচরণীয় কৃত্য এবং এই সংক্রান্ত গানের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের জনসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল এই মদনকাম বা কান্দেব পূজা এবং সংশ্লিষ্ট উৎসব। বিষয়টির ব্যাপকতা বিস্তারিত সমীক্ষা, আলোচনা এবং আরও গভীরতর বিশ্লেষণ দাবি করে।

সূত্র নির্দেশ :

১। জাগ গান—সুখবিলাস বর্মা, ১৯৯৭, পুস্তক বিপণি, প্রকাশক-পরিতোষ দত্ত, পৃ-২৩।

২। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, পি.এইচ.ডি. গবেষণাপত্র, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—গিরিজাশঙ্কর রায়, ১৯৭৫, পৃ-৩০-৩১।

৩। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ—গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১৩।

৪। জাগ গান—সুখবিলাস বর্মা, পৃ-৪৮।

৫। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-২০/০৪/২২।

৬। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-২০/০৪/২২।

৭। জাগ গান—সুখবিলাস বর্মা, পৃ-১১২।

৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-২০/০৪/২২।

৯। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজপুরোহিত, কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি,কোচবিহার, তাং-১৪/০৪/২২।

১০। সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-২১/০৪/২২।

১১। সাক্ষাৎকার—জানকীনাথ চক্রবর্তী, কোচবিহার গুঞ্জবাড়ি ডাঙর আই মন্দিরের পুরোহিত, স্থান-ডাঙর আই মন্দির, কোচবিহার, তাং-১৫/০৪/২২।

১২। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজপুরোহিত, কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি,কোচবিহার, তাং-১৪/০৪/২২।

১৩। সাক্ষাৎকার—জানকীনাথ চক্রবর্তী, কোচবিহার গুঞ্জবাড়ি, ডাঙর আই মন্দিরের পুরোহিত, স্থান-ডাঙর আই মন্দির, কোচবিহার, তাং-১৫/০৪/২২।

১৪। সাক্ষাৎকার—হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজপুরোহিত, কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি, কোচবিহার, তাং-১৪/০৪/২২।

১৫। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—শচীন দেবশর্মা, তুফানগঞ্জ দামেশ্বর মহাদেব ধামের পুরোহিত, স্থান-বারকোদালী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, তাং-১৫/০৪/২২।

১৬। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—গুঞ্জবাড়ি ডাঙর আই মন্দিরের দেউরী, কোচবিহার, তাং-১৫/০৪/২২।

১৭। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—শচীন দেবশর্মা, তুফানগঞ্জ দামেশ্বর মহাদেবের ধামের পুরোহিত, স্থান-বারকোদালী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, তাং-১৫/০৪/২২।

১৮। জাগ গান—সুখবিলাস বর্মা, পৃ-২৭।

১৯। তদেব।

২০। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—অনন্ত অধিকারী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, তাং-১৬/০৪/২২।

২১। জাগ গান—সুখবিলাস বর্মা, পৃ-২৭

২২। তদেব। পৃ-২৬

২৩। তদেব।

২৪। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক,

ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-১৬/০৪/২২।
২৫। সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-২০/০৪/২২।
২৫। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার—অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার, তাং-২০/০৪/২২।
২৭। শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পাদক শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেবসাহিত্য কূটীর, ১৯৭৭, পৃ-৯৪০-৪১।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বন—গিরিজাশঙ্কর রায়।
২। জাগ গান—সুখবিলাস বর্মা।
৩। শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পাদক—শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার :

১। অমূল্য দেবনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, ভেটাগুড়ি, কোচবিহার।
২। অনন্ত অধিকারী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।
৩। হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজপুরোহিত, কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি, কোচবিহার।
৪। জানকীনাথ চক্রবর্তী, কোচবিহার গুঞ্জবাড়ি ডাঙর আই মন্দিরের পুরোহিত, স্থান-ডাঙর আই মন্দির, কোচবিহার।
৫। গুঞ্জবাড়ি ডাঙর আই মন্দিরের দেউরী। কোচবিহার।
৬। শচীন দেবশর্মা, তুফানগঞ্জ দামেশ্বর মহাদেবের ধামের পুরোহিত, স্থান-বারকোদালী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।